পরিবেশ-নারীবাদ তত্ত্বের আলোকে অমিয়ভূষণ মজুমদারের *সোঁদাল* : একটি পর্যালোচনা

সোহানা মাহবুব*

[**সারসংক্ষেপ:** অমিয়ভূষণ মজুমদারের বেশ অনেকগুলো উপন্যাসে নারী ও প্রকৃতি একাকার হয়ে আছে। তাঁর সাহিত্যে নারী যেমন প্রকৃতিকে ধারণ করে আছে, প্রকৃতিও তেমনি নারীর আশ্রয় হয়ে উঠেছে। তাঁর রচনাকর্মে প্রকৃতি বা অরণ্যের বিনষ্টিকরণ এবং নারীর নিগ্রহ— বিষয় দুটো একই সুতোর দুইপ্রান্ত। পরিবেশ-নারীবাদী তাত্ত্বিকেরাও নারী ও প্রকৃতি নিয়ে কাজ করেন। এ তত্ত্বের মূল উপজীব্য বিষয় নারী ও প্রকৃতির ওপর নেমে আসা বর্বরোচিত আঘাতের বিরুদ্ধে তাদের দৃঢ় অবস্থান। বর্তমান প্রবন্ধে পরিবেশ নারীবাদী তত্ত্বের আলোকে অমিয়ভূষণের *সোঁদাল* উপন্যাসে বিধৃত অরণ্যবিনষ্টিকরণ এবং নারীর ওপর পাশবিক অত্যাচারের রূপরেখা বিশ্লেষিত হয়েছে। উপন্যাসে রূপায়িত হয়েছে রাভা গোষ্ঠীভুক্ত নারী-পুরুষের সাংস্কৃতিক পরিচয়, মাতৃতন্ত্রের বিনাশ এবং বিনাশজাত সংকট, তাদের ভূমিসংকট, অরণ্যচারী সত্তা, পুঁজিবাদ প্রসারণে অরণ্যখেকো সুবিধাবাদী গোষ্ঠীর অরণ্যনিধনযজ্ঞ, অরণ্যবিচ্ছিন্নতায় তাদের অস্তিত্বসংকট এবং অরণ্যচারী নারী তিন্নির ওপর নেমে আসা পাশবিক অত্যাচারের সার্বিক রূপ। এ প্রবন্ধে পরিবেশ-নারীবাদ তত্ত্বের আলোকে উপন্যাসে বিধৃত নারীর নিগ্রহ ও অরণ্য বিনষ্টের যৌথ রূপচিত্র পর্যালোচনায় আমরা *সোঁদাল* উপন্যাসে নতুন একটি মাত্রা যোগ করতে সচেষ্ট।]

অমিয়ভূষণ মজুমদারের (১৯১৮-২০০১) *সোঁদাল* উপন্যাসের প্রকাশকাল ১৩৯৪ বঙ্গাব্দ। এ উপন্যাসে লেখক উত্তরবঙ্গের অরণ্যের ক্ষয়িষ্ণু চেহারার সমান্তরালে আদিবাসী রাভা নারীদের পাশাপাশি অসুর গোত্রের অরণ্যচারী এক নিগৃহীত নারীর গল্প লিখেছেন। অমিয়ভূষণের অনেকগুলো উপন্যাসে নারী ও প্রকৃতি একাকার হয়ে আছে। উপন্যাসগুলোর মূল উপজীব্য বিষয়, যন্ত্রসভ্যতা প্রসারণে অরণ্যসভ্যতার বিনাশ এবং নারীর উপর পুরুষতন্ত্রের অত্যাচার। নারী ও অরণ্য— এ দুয়ের ওপর পুঁজিবাদী পুরুষতন্ত্র এবং যন্ত্রসভ্যতার আগ্রাসী নখরের চিহ্ন মেলে অমিয়ভূষণের *হলং মানসাই উপাখ্যান* (১৩৭৩), *দুখিয়ার কুঠি* (১৯৫৯) *মহিষকুড়ার উপকথা* (১৯৮১) ইত্যাদি উপন্যাসে। উল্লিখিত উপন্যাসগুলোয় বর্ণিত নারী এবং প্রকৃতির ওপর নেমে আসা আগ্রাসনের বর্ণনা পাঠককে ‘ইকোফেমিনিজম’ বা ‘পরিবেশ-নারীবাদে’র কথা মনে করিয়ে দেয়। অমিয়ভূষণ মজুমদার ইকোফেমিনিজম বা পরিবেশ-নারীবাদ তত্ত্বের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন কিনা সেটি জানা না গেলেও উল্লিখিত উপন্যাসে বিন্যস্ত নারী ও প্রকৃতির নিগৃহীত সত্তার স্বরূপ বিশ্লেষণে এ তত্ত্ব প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে। বর্তমান প্রবন্ধে এ তত্ত্বের আলোকে *সোঁদাল* উপন্যাসটি ব্যাখ্যা করবার প্রয়াস থাকবে।

---

* সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

https://doi.org/10.62328/sp.v57i1-2.2

১৯৭৪ সনে ফ্রাঁসোয়া দোবন (Francoise d' Eaubonne) প্রথম ইকোফেমিনিজম শব্দটি তাঁর *Le Fe'minisme ou la Mort* (1974) গ্রন্থে ব্যবহার করেন। 'মূলত নারীর প্রতি কর্তৃত্ব ও প্রকৃতির উপর আধিপত্য বিষয়ক মতামতকে নিয়ে হচ্ছে পরিবেশ-নারীবাদ। নারী ও প্রকৃতির উপর মানুষের আধিপত্য সম্পর্কীয় মতবাদকে পরিবেশ নারীবাদ হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়।' (রাশিদা, ২০১৮: ৭৬) সহজ ভাষায়, পরিবেশ নারীবাদ হলো 'Ecofeminism is to define it as a meeting between feminism and ecology' (Alicia, 2017)। পরিবেশ নারীবাদে নারীর সাংস্কৃতিক-ধর্মীয়-রাজনীতিক-সাহিত্যিক অস্তিত্বের ওপর পুরুষের পীড়ন এবং প্রকৃতি বা পরিবেশ দূষণে পুঁজিবাদী পুরুষতন্ত্রের ভোগবাদী সত্তার একাধিপত্যকে চিহ্নিত করা হয়। সত্তরের দশকের দুটি শক্তিশালী আন্দোলনের একটি পরিবেশবাদ এবং অন্যটি নারী স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা সম্পর্কিত মতবাদ পরিবেশ-নারীবাদ তত্ত্বকে প্রতিষ্ঠা দেয়। পরিবেশবাদ এবং নারীবাদের দৃষ্টিকোণ থেকে পুঁজিবাদী পিতৃতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য হলো নারী ও প্রকৃতির ওপর নিপীড়ন, শোষণ এবং ভীতিপ্রদর্শন। সমালোচক মনে করেন:

> Ecofeminism argues that there is a parallal between women and nature that comes from their shared history of oppression by a patriarchal society. Ecofeminists...feel that men dominate women and humans dominate nature. Naturally, then women and the environmentalist should be united in their struggle (Afroza, 2017: 10).

প্রকৃতির ক্ষয়সাধন এবং নারীর প্রতি আগ্রাসনে পুঁজিবাদী পুরুষতন্ত্র গভীরভাবে যুক্ত। পরিবেশ নারীবাদী তাত্ত্বিকেরা পুঁজিবাদী পুরুষতন্ত্র কর্তৃক সংঘটিত এ দ্বৈতক্ষয়ের রূপরেখা চিহ্নিত করবার মধ্য দিয়ে নারী ও প্রকৃতিকে নিরাপদ রাখতে চান। এ পটভূমির আলোকে অমিয়ভূষণের *সোঁদাল* উপন্যাস আলোচনা করা প্রয়োজন, যেখানে ধ্বংসপ্রাপ্ত অরণ্য ও নিগৃহীত নারী মূল উপজীব্য বিষয়। তবে, পরিবেশ নারীবাদের পাশাপাশি আরও কয়েকটি বিষয় এ উপন্যাসে মুখ্য হয়ে আছে। রাভা সম্প্রদায়ের কথকতা, নকশাল আন্দোলন, আন্দোলনকারী মোদনাথ রাভার ব্যক্তিগত বেদনা, ব্যর্থতা ও যন্ত্রণার ইতিহাস, পুঁজিবাদী যন্ত্রসভ্যতার লেলিহান আগ্রাসনে অরণ্যজীবন এবং কৃষিসভ্যতার বিনষ্টির সমান্তরালে অরণ্যচারী মানুষের ওপর নেমে আসা বিপর্যয় ও বর্বরতা, রাভা গোষ্ঠীর ভূমিকেন্দ্রিক অস্তিত্বসংকট, রাভা নারীদের নিগৃহীত সত্তার বেদনা, পুঁজিবাদী শক্তির প্রতিনিধি অমল তরুরাজ আর কৈচন্দ্রের কাঠ চোরাচালান ব্যবসা, অরণ্যখেকো কৈচন্দ্র এবং খোকনেন্দ্রর অরণ্য উজাড় প্রকল্পসম্ভূত ধ্বংসপ্রায় অরণ্যের ন্যাড়া চিত্র, পুঁজিবাদী পিতৃতন্ত্র কর্তৃক অরণ্যচারী নারী তিন্নির নিগ্রহের বেদনাচিত্র, ধনোৎপাদন পদ্ধতির নানা কৌশলে গ্রস্ত মানবতাবাদ, সীমান্তের ফ্রি ট্রেড জোনের ফাটা কাপড়, সমাজভিত্তিক বনসৃজন, হংকং এক্সপ্রেসসম্বলিত অরণ্যহীন নাগরিক জীবনের অনিবার্য কদর্যতা, জোতদার পার্টি এবং তৎকালীন ক্ষমতাসীন সরকারি দলের মধ্যকার পারস্পরিক দ্বন্দ্ব কিন্তু স্বার্থবাদিতায় তাদের একাত্মতা, ভোটের

রাজনীতি ও সুবিধাবাদের মতো বিষয়গুলো এ উপন্যাসে উঠে এসেছে। এতগুলো বিষয়ের ভেতর ধনোৎপাদন পদ্ধতির প্রসারণে অরণ্যের বিনাশ সাধন, অরণ্যচারী মানবজীবনের বিনষ্টি, অরণ্য ও কৃষিজীবনচারী রাভা গোষ্ঠীর ভূমিবিপর্যয়, মাতৃতান্ত্রিক রাভা নারীর ওপর পুরুষতন্ত্রের গভীর নির্যাতন, পুঁজিবাদী পিতৃতন্ত্র কর্তৃক নির্যাতিত অরণ্যচারী অসুরগোষ্ঠী-নারী তিন্নির আর্তনাদ এ উপন্যাসে কেন্দ্রীয় মনোযোগের বিষয় হয়ে ওঠে। ইকোফেমিনিজমের দৃষ্টিকোণ থেকে এ বিষয়গুলোকেই বর্তমান প্রবন্ধে ব্যাখ্যা করতে সচেষ্ট হব।

অমিয়ভূষণ মজুমদার শুধু এ উপন্যাসেই নয়, তাঁর *মহিষকুড়ার উপকথা*, *দুখিয়ার কুঠি* কিংবা *হলং মানসাই উপকথা* উপন্যাসেও আদিপ্রাণ আরণ্যক মানুষের জীবন ও অস্তিত্বসংকটের বেদনাকে গাঢ় করে তুলেছেন। যন্ত্রসভ্যতার বৈনাশিক রূপের নানা মাত্রা তিনি স্পষ্ট করেছেন এ উপন্যাসগুলোতে। আদিপ্রাণ মানুষ, বিশেষ করে আদিপ্রাণ নারীর সত্তায় জড়িয়ে থাকা অরণ্য বিনষ্ট হলে, কিংবা অরণ্যকে ধারণ করে বেঁচে থাকা নারীর ওপর পিতৃতন্ত্রের ঘৃণ্য আগ্রাসন নেমে এলে তারা যে শেকড়বিচ্ছিন্নতার মুখোমুখি হন, অস্তিত্বসংকটে পতিত হন, এসব উপন্যাসে সেই বিষয়টি প্রকট হয়ে উঠেছে। পরিবেশ নারীবাদীদের মতে, “There are important connections between the domination and oppression of women and the domination and exploitation of nature. ...the domination of women and the domination of nature have occurred together, women have a particular state in ending the domination of nature, ‘inhealing the alienated human and non-human nature” (Bina, 2005: 68). অমিয়ভূষণের উপন্যাসে এ যোগ উপলব্ধি করা যাবে। ‘বার্কল্যান্ড ক্রফট ১৯৯৩ সালে তাঁর এক প্রবন্ধে নারীর মতো উপজাতি ও উপজাতীয় সংস্কৃতির উপর আঘাতের বিরোধিতাকে পরিবেশ-নারীবাদের সাথে যুক্ত করেন। কারণ নারীর মতো উপজাতিরাও প্রকৃতির খুব কাছাকাছি বা প্রকৃতির মধ্যেই থাকে। এদের ওপর আঘাত মানেও প্রকৃতির ওপরই আঘাত। তারা প্রকতির মধ্যে বাস করে, প্রকৃতি থেকে অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থানের ব্যবস্থা করলেও তারা প্রকৃতিকে রক্ষাও করে’ (মাসুদ, ২০২২: ৫৩)। কাজেই, *দুখিয়ার কুঠি*, *হলং মানসাই উপকথা* কিংবা *সোঁদাল* উপন্যাসে যে আদিবাসী জাতির ওপর আঘাতের প্রকাশ আছে, সেটি এই উপন্যাসগুলোকে পরিবেশ নারীবাদের সঙ্গে যুক্ত করে দিয়েছে। অমিয়ভূষণের উপন্যাসে যন্ত্রসভ্যতা ও পুঁজিবাদী পুরুষতন্ত্রের বিরুদ্ধাচারণ করে শেষপর্যন্ত টিকে থাকা নারীদের ভেতর কমরুন, মালতী, ডাঙ্গর আই, ফুলমতী, চন্দানি কিংবা তিন্নির ওপরেই যে বিনষ্ট অরণ্যেও লুপ্ত লাবণ্য ও গরিমা ফিরিয়ে দেবার ভার ন্যস্ত হবে, উপন্যাসগুলোতে তার প্রতীকী প্রকাশ ঘটিয়েছেন লেখক। অন্য উপন্যাসগুলোর মধ্যে *হলং মানসাই উপকথা* উপন্যাসে এ বিষয়টির একটি স্পষ্ট রূপরেখা এঁকেছেন অমিয়ভূষণ। উপন্যাস শেষে সন্তানহারা চন্দানির হাতে মৃত বাঘিনীর সদ্যোজাত ব্যাঘ্র শাবক তুলে দেবার

প্রতীকীচিত্রের মধ্য দিয়ে লেখক অরণ্যের ভার নারীর ওপর ন্যস্ত করবার এক সুস্পষ্ট ইঙ্গিত দেন। ইকোফেমিনিজমেও নারীই যে অরণ্য ও সুস্থ পরিবেশের ধারক, সে বিষয়টির ওপর জোর দেওয়া হয়। সমালোচক মনে করেন:

> পৃথিবীতে যুদ্ধ, সাম্রাজ্য, বিজ্ঞান, শিল্পের ইতিহাস হচ্ছে পুরুষের ইতিহাস। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে নারীর অবদানকে অস্বীকার করে এসেছে এই পুরুষতান্ত্রিক সমাজ। ইকোফেমিনিস্টরা মনে করে পৃথিবীর সকল সভ্যতা, সংস্কৃতি নির্মাণে নারীর ভূমিকাকে কেবলই উপেক্ষা করা হয়েছে। সভ্যতার উন্নতির দোহাই দিয়ে একের পর এক পরিবেশ ধ্বংস করাটা মোটেও যৌক্তিক নয়। মাতৃপ্রধান বা পরিবেশকেন্দ্রিক সমাজব্যবস্থায় পরিবেশ যেমন সুরক্ষিত ছিলো, তেমনি নারীরা নিজেই স্বাবলম্বী ছিলো। তাই পরিবেশকে বাঁচিয়ে, নারীকে সমান অধিকার দিলেই এই পৃথিবী সমূহ ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পাবে। (মন্দ্র আর্কাইভ, ২০২০)

অমিয়ভূষণ মজুমদার সর্বদাই কেন্দ্রের চাইতে প্রান্তিক মানুষের প্রতি বেশি সহমর্মী। প্রান্তিক মানুষেরাই পরিবেশ ও প্রকৃতির ত্রাতা। প্রান্তিক মানুষের কথা বলতে গিয়ে প্রান্তজনের সত্তায় জড়ানো অরণ্য ও মৃত্তিকার কথা অমিয়ভূষণের সাহিত্যে তাই বার বার উঠে আসে। 'নিজের কথা' প্রবন্ধে এ প্রসঙ্গে তিনি মন্তব্য করেন:

> উত্তরবঙ্গের উত্তরখণ্ডে আমার বাস।... আসলে আমি জানি আমার মা যে জেলার মেয়ে, তোমরা নিষাদ, শবর, পুলিন্দ বলবে কিনা ভেবে দেখো, বা শান্তনুর স্ত্রী সত্যবতীর বোন, তাকে রুগ্ন ছেলেমেয়ের জন্য কলকাতার এক হাঁটু কাদায় গেঁড়িগুগলি তুলতে হয় বটে, কিন্তু তার কপালে সে-সময়েই কাঞ্চনজঙ্ঘা হিরার মুকুট।... আসলে আমার বিশ্বাস কলকাতা নামক ঔপনিবেশিক শহর ও কনজুমার গুডসের আড়তের বাইরে মেদেনীপুর থেকে বীরভূম, পুরুলিয়া থেকে নদীয়া সীমান্তে ছড়ানো কলকাতার বাইরের যে-ভূমি যাকে তোমরা গ্রামবাংলা বলো... যাকে প্রকৃতপক্ষে হিন্টারল্যান্ড ভাবা হয়, যেখানে দলদলে কাদায় পা পুঁতে দাঁড়িয়ে, ভালুক ভালুক চেহারার কালো-কালো কৃষকেরা ঔপনিবেশিক শহরের অন্ন তৈরি করে, তথাকথিত শ্রমিকদের ডিয়ারনেস অ্যালাউন্সের যোগান ঠিক রাখে, যে-ভূমিতে নীল বিদ্রোহ, চাষী বিদ্রোহ, সাঁওতাল বিদ্রোহ, যে ভূমিতে বঙ্কিমচন্দ্র সন্ন্যাসী বিদ্রোহের অবস্থান পাতেন সেই ভূমি যা কলকাতার চাইতে অনেক অনেক বড়ো,... সেই আমাদের মাতৃভূমি,...। (অমিয়ভূষণ, ২০০২: ১৮)

এ দলদলে কাদায় পা পুঁতে দাঁড়িয়ে থাকা প্রান্তিক নিগৃহীত নারী এবং পুরুষ নিয়েই অমিয়ভূষণের অনেকগুলো উপন্যাস রচিত। *সোঁদাল* উপন্যাসে রাভা এবং অসুরগোষ্ঠীর কথা বলেছেন লেখক, যাদের অস্তিত্বের সঙ্গে গভীরভাবে জড়িয়ে আছে অরণ্য। নৃবিজ্ঞানীরা সমীক্ষায় বলেন, "অধিকাংশ রাভা-ই অরণ্যচারী। 'বনসংরক্ষণ আইন'-এর ফলে রাভারা অরণ্য-জীবন পরিত্যাগ করে সরকারের শ্রমিক হিসাবে নিযুক্ত হয়েছে।" (সুবোধ, ২০১০: ৪৪)। রাভা সম্প্রদায়ের মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির যোগ নিবিড়। অতীতে তারা জুম চাষ করতেন, লাঙল দিয়ে কৃষিকাজের বিষয়টিতে তারা পারঙ্গম ছিলেন না। উপন্যাসের শুরুতে ঔপন্যাসিক এ প্রসঙ্গে আলোকপাত করেছেন এভাবে:

> বনের মধ্যে কোদালের জুমচাষের চাইতে বন হাসিল করে লাঙ্গলের চাষ অবশ্যই ভালো।... ধান উৎপাদন পদ্ধতি যে কোনো সমাজের সভ্যতা, সংস্কৃতি, ধর্ম ইত্যাদিকে নির্ধারিত করে, সে তো এখানকার নানা অধিবাসীদের মধ্যে রাভাদের লক্ষ্য করলেই বোঝা যায়। তারা তো বলে, 'নাং কোচা'— আমরাই কোচ। আর গারো পাহাড়ের আদিবাসীরা শৌর্যবীর্যে সকলকে ছাপিয়ে উঠতে থাকলেও (তারা তো তখন পশুপালক পশুশিকারীর স্তরে) পাহাড়ের গায়ে জুম চাষ ছাড়া কিছু জানত না। তারা এই সমতলবাসী কোচদের ডেকে নিয়ে গিয়েছিল ধান চাষ শিখতে— এই ডাক থেকেই, রব থেকেই তারা রাভা। আর সেজন্যই ধানজমি আর রাভাকন্যা আর রাভাগৃহ, এক থেকে অন্যটা পৃথক হয় না। (অমিয়ভূষণ, ২০১০: ৮০)

ঊনবিংশ শতাব্দীর ষষ্ঠ দশকে ইংরেজ শাসকেরা জলপাইগুড়ি, ডুয়ার্স এবং আসামের জঙ্গলগুলোকে 'সংরক্ষিত বনাঞ্চল' হিসেবে ঘোষণা করবার পর রাভাদের জীবনে পরিবর্তন এলো। রাভাগোষ্ঠী বিতাড়িত হলো অরণ্যের কোল থেকে। মাতৃতান্ত্রিক পরিবার হিসেবে রাভাদের ওপরকার এই পরিবর্তন পুরুষের চাইতে নারীর ওপর বেশি। কেননা, নারীরা প্রকৃতিকে ধারণ করে। প্রকৃতি আদিবাসী নারীর আব্রু রক্ষা করে। যন্ত্রসভ্যতার আগ্রাসনে শুধু নারীর আব্রু নয়, এক গ্রাম থেকে আরেক গ্রামের মধ্যে অরণ্যের যে আড়াল ছিল, সেটিও ক্রমশ উবে যেতে থাকে। অর্থাৎ অরণ্যের উচ্ছেদ ঘটে। অমিয়ভূষণ দেখাচ্ছেন:

> অন্ধকার, অন্তত আধো-অন্ধকার, সবুজ মিশানো কালচে অন্ধকার থেকে হলুদ-ধূসর-উজ্জ্বল সূর্যালোকে, আদিমতা থেকে আধুনিকতায় পৌঁছে যাচ্ছে জেলাকে জেলা। আর সবই এই গত কয়েকটা বৎসরে। গ্রামগুলোর মধ্যে মধ্যে, গ্রাম আর শহরের মধ্যে এই অবস্থায় আড়াল, আবডালও থাকে না। গ্রামের লাগালাগা বন দূরের কথা, বনের সঙ্গে লাগালাগা দু-চার হাজার একরের ছোট বন ঠিক দু-বছরের মাথায় ধানখেত, পাটখেত, গ্রাম আর গঞ্জ হয়ে যাচ্ছে। কী অদ্ভুতভাবে অলস, ভবিষ্যদ্দৃষ্টিহীন, আদিম মনের মানুষেরা ছিল এখানে। (অমিয়ভূষণ, ২০১০: ৭৮)

অমিয়ভূষণ উপন্যাসে ঋদ্ধ এক অরণ্যদিনের কথা স্মরণ করাতে চান। আজকের বিপন্ন অরণ্য এককালে তার বৃহৎ সত্তা নিয়ে উপস্থিত ছিল মাইলের পর মাইল:

> অন্য কোথাও বনের প্রাধান্য ছিল। যেমন এই অঞ্চলটারই উত্তর অংশটায়, অথবা এই বহতা নদীটা পার হয়ে সদর শহরটার পশ্চিমে পশ্চিমে চলে, এ গ্রাম সে গ্রামের পাশ ঘেঁষে ঘেঁষে, এমনকি বহতা নদীর এখাত সেখাত পার হয়ে হয়ে, কোলের কাছে একটা দুটো গ্রাম রেখে রেখে, এক মহাবন আর এক মহাবনকে স্পর্শ করে করে বিরাজ করত। আর সেসব বনে, যেমন হয়, দিনেও আলো হয় না, জোনাকি জ্বলে এমন অঞ্চলও ছিল। গাছগাছালি ছিল, ঝর্ণা ছিল, বড় নদীর ছোট ছোট শাখা ছিল; হাতিঘাস ছিল, বুনোঘাস ছিল, জলে শাপলা-শালুকের, হোগলার, কাশের সমারোহ থাকত। আর সেই অগম বনের অন্তঃস্থলে, কখনও সেই বনে হারিয়ে গিয়ে, বুনো মানুষের গোষ্ঠীও থাকত। (অমিয়ভূষণ, ২০১০: ৭৯)

মানুষের লোভের আগুনে এখন বিপন্ন এ অরণ্য প্রকৃতি। অমিয়ভূষণ এ বিপন্নতা প্রকাশ করেছেন গভীর প্রত্যয়ে। একটি মহাবন কীভাবে মানুষের লোভের আগুনে উজাড় হয়ে যায় ক্রমশ, তার একটি অনুপুঙ্খ চিত্র মেলে উপন্যাসে। প্রসঙ্গত মনে পড়ে পরিবেশ-নারীবাদী আন্দোলনের অংশ হিসেবে খেজারলি হত্যাকাণ্ডের (১৭৩০) কথা; কিংবা, ভারতের উত্তরখণ্ডের নারীরা যে ১৯৭৩ সালে বনউজাড় প্রকল্পের বিরুদ্ধে চিপকো আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন, তার কথা। হিমালয় পর্বতের অমূল্য অরণ্য রক্ষার্থে এ আন্দোলন ছিল ভারতের প্রথম সংগঠিত পরিবেশ আন্দোলন। এ আন্দোলনগুলো সম্পর্কে অমিয়ভূষণ মজুমদার অবগত ছিলেন বলেই মনে হয়। *সোঁদাল* রচিত হচ্ছে ১৯৮৬ সনের দিকে। সেক্ষেত্রে অরণ্যনিধনের মতো বর্বরতার প্রতিবাদে চিপকো আন্দোলনে অংশগ্রহণ করা নারীদের সক্রিয়তা হয়তো অমিয়ভূষণকে আলোড়িত করে থাকবে। সেই আলোড়নের ফলেই হয়তো তিনি *সোঁদাল* উপন্যাসের দুবৃত্ত কর্তৃক অরণ্যউজাড় প্রকল্প চিহ্নিত করেন এভাবে:

> একটা হরিণী এক ঋতুতে আর একটা মাত্র হরিণ দিতে পারে, এক হস্তিনী আর এক হস্তিনীকে আনতে দুবছর সময় নেয়, এক শাল থেকে আর এক শাল হতে ষাট-সত্তর বছর লাগে, এক মেহগ্নি থেকে আর এক তেমন মেহগ্নি থেকে দুশো বছর লেগে যেতে পারে, একটা বন হতে হাজার বছর লেগে যায়। একটা ধানখেত তৈরি হয় এক বছরে। একটা ধান এক মরসুমে হাজারটা ধান আনে। এই আবিষ্কার থেকেই তো মানুষ মানুষ হল। যদি এক মুঠো ধান লাগালে গোলা ভরে ওঠে, এক গোলা ধান লাগালে কি গোটা একটা গ্রামকেই ধানের গোলাঘর করা যায় না? বনের মধ্যে কোদালের জুমচাষের চাইতে বন হাসিল করে লাঙ্গলের চাষ অবশ্যই ভালো। (অমিয়ভূষণ, ২০১০: ৮০)

পুঁজিবাদী পিতৃতন্ত্রের এ অরণ্যকে গ্রাস করে প্রবল পুঁজির পাহাড় গড়ে তোলার বিরুদ্ধে সোচ্চার পরিবেশ নারীবাদ। যে নারী প্রকৃতি বা অরণ্য সংরক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে, অরণ্যনিধনের পর সে যেন আশ্রয়শূন্য হয়ে পড়ে। সমালোচকের মতে:

> পুঁজিবাদী পিতৃতান্ত্রিক বৈশ্বিক ব্যবস্থা, যা রেনেসাঁ প্রকল্পের উপনিবেশবাদী অজস্র দ্বি-কেন্দ্রিকতা [dichotomics] ও আধুনিক হ্রাসবাদী বিজ্ঞানের সাহায্যে [Reductionst Science] গত পাঁচশ বছরেরও অধিক সময় ধরে প্রকৃতি/নারী/শিশু ও অশ্বেতকায় নারী-পুরুষকে 'উপনিবেশ' হিসেবে ব্যবহার করে গড়ে তুলেছে প্রবল পুঁজির সঞ্চয়,... ইকোফেমিনিজিম সেই পিতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থাকেই ভাঙ্গতে চায় সর্বশক্তি দিয়ে। রেনেসাঁ প্রকল্পের তথাকথিত উন্নয়ন ভোগবাদ, সুপারমার্কেট অর্থনীতি ও পারমানবিক অস্ত্রের 'শিশু কল্পনা' [phallic phantasy]-র পরিবর্তে ইকোফেমিনিজম আবাহন করে 'জীবনযাপনোপযোগী' ও সরল মাতৃ-অধিকারভিত্তিক অর্থনীতি, আবাহন করে প্রকৃতি-প্রাণী-বৃক্ষ ও নারীর পারস্পরিক 'মিথোপযোগিত' [symbioses]। ইকোফেমিনিজম তাই নিন্দা করে তৃতীয় বিশ্বের ওপর উন্নত বিশ্ব কর্তৃক চাপিয়ে দেওয়া উন্নয়নের স্বপ্ন-পুরাণ প্রকল্প [The Myth of Catching up Development]। (অদিতি, ২০২০: ৩৭-৩৮)

প্রকৃতি, নারী, শিশুকে ব্যবহার করে পুঁজিবাদী পুরুষতন্ত্রের প্রবল পুঁজি সঞ্চয় করে তোলার বিরুদ্ধে পরিবেশ-নারীবাদী তাত্ত্বিকদের আন্দোলন। এ বিষয়ে Mothers of East Los Angels (MELA, 1986), Native Americans for a Clean Environment (Nace)-এর মতো নারীপ্রধান দলগুলো পরিবেশসংক্রান্ত নৈতিকতা নিয়ে কাজ করেছে। এছাড়া বিশ শতকের শেষদিকে নারীরা বন্যপ্রাণীর খাদ্য, বায়ুশোধন এবং জলরক্ষা-আন্দোলনের মধ্য দিয়ে পরিবেশ নারীবাদী আন্দোলনে আরও গভীরভাবে যুক্ত হয়। হেনরি ডেভিড থরো, অ্যালডো লিওপোল্ড, জন মুইর এবং রাচেল কারসনের মতো লেখকেরা তাদের লেখনীর মাধ্যমে এ আন্দোলনে যুক্ত হন। রাচেল কারসনের *সাইলেন্ট স্প্রিং* (১৯৬২) এ বিষয়ক একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ। কেনিয়ার পরিবেশবাদী ওয়াঙ্গেরী মাথেই ১৯৭০-এ 'গ্রিন বেল্ট মুভমেন্ট' নামক একটি প্রতিষ্ঠানের জন্ম দেন, যার লক্ষ্য ছিল বৃক্ষরোপণের মাধ্যমে পরিবেশ বিষয়ক সচেতনতা সৃষ্টি এবং নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠা। অমিয়ভূষণের *সোঁদাল* উপন্যাসে এ অরণ্যনিধনযজ্ঞ নিসর্গের প্রতি পুঁজিবাদী পুরুষতন্ত্রের আগ্রাসনকে চিহ্নিত করেছে প্রবলভাবে। শুধু অরণ্যনিধনযজ্ঞই নয়, পুঁজিবাদী পুরুষতন্ত্র মনে করে, নারী প্রকৃতির ধারক আর পুরুষ সংস্কৃতির। এ প্রসঙ্গে সমালোচকের মত প্রণিধানযোগ্য:

> In patriarchal thought, women are identified as being closer to nature and men as being closer to culture. Nature is seen as inferior to culture; hence, women are seen as inferior to men. (Bina, 2005: 68)

পুরুষতন্ত্র কর্তৃক নারী নিগ্রহে এবং মানুষ কর্তৃক অরণ্য-প্রকৃতিকে বিনষ্টিকরণে এ সংযোগ পরিলক্ষিত হয়। *সোঁদাল* উপন্যাসের মলগুঁ দাস রাভাদের জাতীয় ইতিহাস এবং তাদের ভাষার ইতিবৃত্ত ধারণ করে কথা বলে। রাভাদের জনসংখ্যা লোপ কিংবা তাদের ভাষার ক্রমমৃত্যুবরণের মতো সাংস্কৃতিক বিষয়গুলো নিয়ে এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে রাভাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে এ চরিত্রটি। অর্থাৎ এখানে পুরুষ রাভা নিজের ইতিহাস ও সংস্কৃতির ধারক হয়ে উঠেছে। কিন্তু পঙ্কিনী রাভা কিংবা তিন্নির প্রসঙ্গে এ ধর্ম-ভাষা তথা সংস্কৃতিধারণের বিষয়গুলো আলোচনায় আসে না। বরং, সন্তানধারণ, ধান এবং গৃহ রাভাকন্যার একান্ত নিজের বলে তার ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয়। উপন্যাসে বলা হয় সুস্পষ্ট করে, 'পুত্রই হোক অথবা কন্যা, মায়ের পরিচয়েই পরিচয়, মায়ের গোত্রেই গোত্র' (অমিয়ভূষণ, ২০১০: ৮০)। এমনকি মৃত্যুন্মুখ রাভা সন্তানের 'চিকাবায়রাই' সম্পর্কেও একমাত্র রাভা জননী কিংবা তার অনুপস্থিতিতে তার স্ত্রীই শুধু জানতে পারবেন। এ প্রসঙ্গে স্মরণযোগ্য ১৯৭৮ সালে প্রকৃতি ও নারীর ওপর নেমে আসা আগ্রাসনের রূপরেখা চিহ্নিতকরণে রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ সুজান গ্রিফিনের *Woman and Nature* (1978), ম্যারি ডালির *Gyn/ecology* (1978) এবং ক্যারোলিন মারচেন্টের *The Death of Nature* (1980)। এসব গ্রন্থে লেখকেরা একই সঙ্গে নারীর ওপর পুরুষের কর্তৃত্ব এবং প্রকৃতির ওপর সংস্কৃতির আধিপত্যের বিষয়টিকে চিহ্নিত

করেন। একদা মাতৃতান্ত্রিক রাভাগোষ্ঠী আজ পুঁজিবাদী পুরুষতন্ত্রের আগ্রাসনে নিজের ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছে। যে ধানিজমি এবং গৃহ, সংস্কৃতি এবং অর্থনীতির ক্ষমতা এককালে রাভা নারীর হাতে ছিল, সেটি এখন লুপ্তপ্রায়। এখন:

> কে... পঙ্কিনীর সেই ধানের জমি দেখে? ধানের এক খন্দ চোখের জলে ভেসে গেল। দ্বিতীয় খন্দে হল বিশ মণ। তাও তখন জামাই ফিরে এসে ধান কেটেছিল বলে। তৃতীয়বার ধানের খন্দের আগে, রাভা মেয়েরা সেকালে যে সাহস পেত, তেমন সাহস করে জামাইকে বিয়ে করল পঙ্কিনী-পঙ্কজিনী। দশ বছরে সে জামাই গেল যক্ষায়... রাভার বেটির নয় তো ধানখেত থাকিল্। হাঁতি আইসে, রুখিবে? ভৈষা ঢোকে ধানখেতৎ, পেনটি ধরি টানো? বুনো শুয়োর আইসে ধানবাড়ি?, বন কোটে? (অমিয়ভূষণ, ২০১০: ৮১-৮২)

মাতৃতান্ত্রিক পরিবার ভেঙে যাবার পর রাভা নারী তার জমি রক্ষার জন্য শেষপর্যন্ত বিসারু মহম্মদ অর্থাৎ অন্য ধর্মের এক পুরুষকে বিয়ে করে। এতে রাভা নারীর ভূমি রক্ষা পেলেও নিজের নাবালক সন্তান বড় হতে হতে এসব জমির লাভের অংশ ভোগ করে পুঁজিবাদী পুরুষতন্ত্রের ধারক বিসারু মহম্মদ। মোন্নাতের হিসেবে পঙ্কিনীর মতো অসহায় রাভা নারীর ভূমি আত্মসাৎ করে এসব বিসারু মহম্মদেরা এভাবেই হয়ে ওঠে 'বিসারু মহাজন'। এভাবেই পুঁজির ধারক পুরুষতন্ত্র নারী এবং ভূমি আত্মসাতের কাজে লিপ্ত হয়।

নারী পরিবেশবাদী ক্যারেন ওয়ারেন তাঁর 'The Power and Promise of Ecological Feminism' প্রবন্ধে সমাজের বদ্ধমূল ধারণা দ্বারা প্রকৃতি ও নারী নিপীড়নের আরও কিছু বিষয় চিহ্নিত করেছেন। পুরুষতন্ত্র নারী ও প্রকৃতি সম্পর্কে কিছু ধারণার জন্ম দিয়েছে। এসব ধারণাগত কাঠামো 'পীড়নমূলক কাঠামো' নামে পরিচিত। পীড়নমূলক কাঠামোর একটি হলো দ্বৈত মূল্যবোধ বা ডুয়ালিজম। দ্বৈত মূল্যবোধ বা ডুয়ালিজম নারী ও পুরুষের মধ্যে বিভেদের সৃষ্টি করে। এই বিভেদে পুরুষ ও নারী বা প্রকৃতির মধ্যে বিভেদের ক্ষেত্রে ভাবা হয়, পুরুষ যুক্তিবাদী— নারী আবেগপ্রবণ, পুরুষ সবল— নারী দুর্বল, পুরুষ উচ্চমানের— নারী নিম্নমানের ইত্যাদি। কিংবা, পুরুষ সংস্কৃতির ধারক আর নারী প্রকৃতির ধারক। এ প্রসঙ্গে সমালোচকের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য :

> প্রাচীন সমাজে নারী ও পুরুষের কাজের তফাত থেকেই নারী ও পুরুষের ভেদ শুরু হয়ে গেল। সেই প্রাচীনকালের নারীরা জানতেন না— সমাজে এই কাজের ভাগ করে নেওয়ার পরিবেশ থেকেই পরবর্তীকালে বা ভবিষ্যতে মানবসভ্যতার সমস্ত ক্ষেত্রে পুরুষ আধিপত্য প্রভাব বিস্তার করবে। তারাই হয়ে উঠবে সংস্কৃতির ধারক-বাহক আর নারীর কাজ হবে একটি প্রাণী বা বৃক্ষের মতো গর্ভধারণ করা আর মানবজন্ম দিয়ে যাওয়া।... ইতিহাসের গতিপথ ধরে নারীরা হয়ে উঠল পার্থিব জগতের প্রতীক আর পুরুষের পার্থিব যা কিছু থেকে যেন ক্রমশ বিচ্ছিন্ন। তাদের চিন্তা-ভাবনা থেকে তৈরি হল যেসব দর্শন— সেখানেও পুরুষের চোখেই জগৎ ও জীবনকে দেখা হল, বিশ্লেষণ করা হল, পৃথিবী বা

> মাটি যেখান থেকে উদ্ভিদ ও প্রাণীরা জন্মাচ্ছে— তা যেন নারীদের থেকে শিশু জন্ম নেওয়ার মতো একই জাগতিক বা প্রাকৃতিক ব্যাপার। প্রকৃতির নিয়মেই নারী, প্রাণী ও উদ্ভিদ সমার্থক। (বিপ্লব, ২০০৯: ৩৯)

আবার, এসব পীড়নমূলক কাঠামো ছাড়াও কখনও কখনও নারীর ওপর পুঁজিবাদী পুরুষতন্ত্র অপরতাবোধ বা আদারনেসের জন্ম দেয়। সমালোচক মনে করেন, '...Other people' শব্দটির ওপর ভিত্তি করেই গোটা রেনেসাঁ প্রকল্প দাঁড়িয়ে আছে। রেনেসাঁ তার 'ঐতিহাসিক পরমতা'র খাতিরে শুরুতেই তৈরি করে নিয়েছিল একটি আধিপত্যবাদী দ্বিকোটিকরণ, যেমন প্রকৃতি/সংস্কৃতি, বৈশ্বিক/আঞ্চলিক, উন্নয়ন/জীবনধারণ, ব্যবচ্ছেদ/মিথোপযোগিতা, সভ্য/বর্বর, নর/নারী ইত্যাদি। এই প্রতিটি দ্বান্দ্বিক শব্দদ্বয়ের মধ্যে একটিকে অন্যটির তুলনায় শ্রেয়তর বলেই বিজয়ী ধরে নেয়া হবে। যেমন, সংস্কৃতি বা বিজ্ঞান জয় করবে প্রকৃতিকে, সভ্য বর্বরকে, নর নারীকে।' (অদিতি, ২০২০: ৪০) নারী যেহেতু প্রকৃতির ধারক, সুতরাং, নারীর ওপর পুরুষতন্ত্র কর্তৃক আরোপিত এসব পুরুষতান্ত্রিক পীড়নমূলক ধারণাগুলো প্রকৃতির ওপরও চেপে বসে। প্রকৃতি জড় পদার্থ বা অসচেতন, তার কোনো ক্রিয়াকলাপ নেই। পারিপার্শ্বিক পৃথিবীর ওপর সে কোনো প্রভাব বিস্তার বা পরিবর্তন সাধন করতে পারে না, প্রকৃতির সম্পর্কে এরকমটাই ভাবা হয়। *সোঁদাল* উপন্যাসের শুরুতেই অমিয়ভূষণ প্রকৃতির জড়ত্ব সম্পর্কিত ধারণাটিকে খর্ব করেন। প্রকৃতি কিংবা অরণ্য জড় পদার্থ এবং এটি অসচেতন এবং প্রভাব সৃষ্টি করতে পারে না— এ জাতীয় প্রশ্নের উত্তরে তিনি লেখেন:

> বনকে রক্ষা করলে বন তোমাকে রক্ষা করে, এরকম বলা হয়তো বক্রোক্তি-নির্ভর। বনের কি প্রাণ আছে না ব্যক্তিত্ব? এরকম বলা যেতে পারে, দক্ষিণ থেকে এগিয়ে আসা আক্রমণকারীরা অনেকবার বনের দুর্ভেদ্যতার কাছে পরাজিত হয়েছে। সেজন্যই বন। বন বৃষ্টিকে আকর্ষণ করে, এটা হয়তো বা অবৈজ্ঞানিক; কিন্তু বন খালবিল নদীনালাকে শুকোতে দেয় না, মাটিকে নরম রাখে। আর সেজন্য বনের ছায়ায় নদীনালায় তড়াগে অজস্র বড় জাতের সরস ঘাস হতে থাকলে, মোষ আসত, হৃষ্টপুষ্ট হত, সংখ্যায় বৃদ্ধি পেত। (অমিয়ভূষণ, ২০১০: ৮৩)

অরণ্যপ্রকৃতি যেভাবে কৃষিব্যবস্থাকে সারযুক্ত করে, তাতে, অরণ্য বা প্রকৃতিকে কখনোই অনিয়ন্ত্রিত কিংবা জড় বলে বোধ হয়নি অমিয়ভূষণের। সুতরাং নারী ও প্রকৃতি উভয়েই সারবান এবং সুপুষ্ট— পরিবেশ নারীবাদীদের এই বক্তব্যের গভীর প্রতিফলন ঘটেছে উপন্যাসের এ অংশে। পরিবেশ নারীবাদী তত্ত্বে প্রকৃতি ও নারী— একে অপরের মধ্যে রয়েছে গভীর সংযোগ রয়েছে। পরিবেশ নারীবাদী তাত্ত্বিকেরা মনে করেন, 'The feminist movement and the environmental movement both stand for egalitarian, non-hierarchical systems. They thus have a good deal in common and need to work together to evolve a common perspective, theory and practice (Bina, 2005: 68)। সৃষ্টির শুরু থেকে নারী প্রকৃতির সাথে একাকার হয়ে

আছে বলে পরিবেশ নারীবাদী তত্ত্বের জন্ম হয়েছে। একমাত্র নারীরাই প্রকৃতি ও পরিবেশকে সংরক্ষণ করতে সক্ষম। এ উপন্যাসের লেখকও রাভাকন্যা আর ধানজমিকে একাকার বলে মন্তব্য করেন। লেখকের ভাষায়:

> জমি আর কন্যা একই আত্মার দুই পৃথক রূপ, কন্যার গৃহও তাই। পুরুষ লাঙ্গলের ফলা হতে পারে; তারপর তো সে এদিক ওদিক চলে যাবে, কন্যা ছাড়া আর কে লালন করবে ধান! পুরুষ জঙ্গল থেকে বাঁশ, কাঠ, ছন এনে ঘর তুলতে পারে, কিন্তু সেই ঘর যদি একটা রাভাকন্যার শরীরও না হয়, কোথায় আশ্রয় পাবে পুরুষ! সেজন্যই ধানের জমি আর ধান, গৃহ আর সন্তান সব সময়েই রাভাকন্যার, রাভাপুরুষের নয়। পুত্রই হোক অথবা কন্যা, মায়ের পরিচয়েই পরিচয়, মায়ের গোত্রই গোত্র। জমি ধ্রুব, গৃহ ধ্রুব, জননী ধ্রুব। এই ধ্রুবতার আশ্বাস ছাড়া ধান আর সন্তান ভালো হয়? (অমিয়ভূষণ, ২০১০: ৮০)

মাতৃতান্ত্রিক রাভাগোষ্ঠীতে নারী ও ভূমি এবং সন্তানের মধ্যকার নিবিড় সম্পর্কসূত্র পরিবেশ নারীবাদী তাত্ত্বিকদের দৃষ্টিকোণ থেকে ইতিবাচক। নারী এখানে প্রকৃতির এবং ক্রম-অগ্রসরমান প্রাণপ্রবাহের ধারক এবং ত্রাতা। মাতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় নারী পরিবেশ ও প্রকৃতিকে সংরক্ষণ করেছে। কৃষিকাজে নারীরা বহুকালব্যাপী বীজ সংরক্ষণের কাজ করেছে। এ বীজ শুধু কৃষি নয়, সেটি সন্তানও বটে। পরিবেশ নারীবাদের তিনটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা আছে। এদের ভেতর কালচারাল বা স্পিরিচুয়াল পরিবেশ নারীবাদ নারী ও প্রকৃতির মধ্যকার সহজাত আন্তঃসম্পর্কের ওপর জোর দেয়। পৃথিবীকে মাতৃসত্তার ইমেজে উপস্থাপন এবং অরণ্যকে নারী হিসেবে আখ্যা দেবার বিষয়টির ওপর এ ধারার পরিবেশ নারীবাদীরা খুব বেশি জোর দেন। 'লালনপালন' শব্দদ্বয়ের মধ্য দিয়ে নারী ও প্রকৃতি একাকার হয়ে ওঠে। এ ভাবনাই নারীকে প্রকৃতির সঙ্গে যুক্ত করেছে। প্রসঙ্গত খনার কথা মনে পড়ে। প্রাচীনকালে 'সাবসিসটেন্স ইকোনমি' বা সম্পদ উৎপাদনকারী জীবিকা অর্থনীতিতে নারীরা প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ায় ফসল উৎপাদনের কাজে যুক্ত থাকত, সবুজায়নেও তাদের ভূমিকা অসাধারণ ছিল। ১৯৮৯ এবং ১৯৯৪ সালের দিকে ডেট্রয়েট-আফ্রিকান-আমেরিকান নারীদের হাতে ব্যাপকভাবে সবুজায়ন ঘটে। এভাবেই বিশ্বজুড়ে পরিবেশ-নারীবাদী তাত্ত্বিকেরা প্রকৃতি এবং নারীদের অধিকার রক্ষায় নিরলসভাবে তাদের কাজ করে যাচ্ছেন। তবে, প্রাকৃতিক অভিজ্ঞানে ঋদ্ধ এরকম নারীকে একালের পশ্চিমা বিশ্বের পুঁজিবাদী সমাজ সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করতে পারেনি বলেই বন্দনা শিবা মনে করেন। তাঁর মতে:

> Forests have always been central to Indian civilization; they have been worshipped as Aranyani, the goddess of the forest, the primary source of life and fertility, The diversity, harmony and slef-sustaining nature of the forest formed the organizational principles guiding Indian civilization; the aranya samskriti (roughly translatable as 'the culture of the forest' or 'forest culture') was not a condition of primitiveness, but one of conscious choice (Vandana, 1988: 53)

মাতৃতন্ত্রের ক্ষমতা পিতৃতন্ত্রের হাতে ন্যস্ত হবার বিষয়টি ক্রমশ আত্মপ্রকাশ করে। সমালোচকের মতে:

> আদিম সমাজের বিকাশে একটি বিশেষ পর্যায় ছিল মাতৃতন্ত্র। এই পর্যায়ের সামাজিক এবং অর্থনৈতিক জীবনে নারীর ভূমিকা ছিল প্রধান। সমাজের বিকাশের একেবারে গোড়ার দিকে মানুষের জীবন এবং জীবিকার প্রাথমিক পর্যায়ে নারী-পুরুষের সম্পর্ক ব্যক্তির ভিত্তিতে সীমাবদ্ধ ছিল না।... যৌথ বিবাহের ফলে সন্তান এবং বংশধারার জন্য বর্তমানের ন্যায় পিতাকে নির্দিষ্ট করা সম্ভব হতো না। মাতাই ছিল সন্তানের পরিচয় সূত্র। মাতৃপক্ষ হতেই সন্তানের বংশধারা নির্দিষ্ট হতো।... গোত্র জীবনের অর্থনীতিরও পরিচারিকা ছিল নারী। পুরুষ পশু শিকার করত, কিন্তু পশুশিকার জীবিকা নির্বাহের কোনো নিশ্চিত বা নির্ভরশীল উপায় ছিল না। শস্যক্ষেত্রে বীজবপন, সন্তানপালন, গৃহরক্ষা প্রভৃতি কাজের দায়িত্ব ছিল নারীর। পশুপালন জীবিকার অন্যতম উপায় হওয়ার পরে সামাজিক জীবনেও পরিবর্তন ঘটতে শুরু করে। এই সময় থেকে জীবিকা নির্বাহে পুরুষ প্রধান ভূমিকা পালন করার এবং দাসদের খাটানোর দায়িত্ব পুরুষ গ্রহণ করতে থাকে।... পিতৃতান্ত্রিক সমাজের গোড়াপত্তন এই সময়েই ঘটে। (সরদার, ২০০৬: ৩০৫)

একালে মাতৃতন্ত্রের ক্ষমতা যখন পুরুষতন্ত্রের হাতে চলে গেছে, তখন, ভোগবাদী পুরুষতন্ত্র নারী ও পুঁজিবাদী সংস্কৃতি প্রকৃতিকে একই সঙ্গে নিজের অধস্তন ভাবতে শুরু করেছে। এবং শুধু অধস্তনই নয়, কখনও কখনও নিসর্গের প্রতি তার ইতিবাচক ভূমিকার ওপরও নির্বিচারে চালানো হয়েছে বর্বরোচিত আক্রমণ। সমালোচক মন্তব্য করেন:

> আধুনিক হ্রাসবাদী বিজ্ঞানের কঠোর প্রকৃতি-বিধ্বংসী নীতির প্রতিবাদ করতে যেয়ে রেনেসাঁর সূচনা-সময়ে প্রাণ হারান লক্ষ লক্ষ 'ডাইন'। 'ডাইনী' ভাষণে নিন্দিত এই নারীরা প্রকৃতির সঙ্গে... ঘরকন্না করতে জানতেন। তাঁদের ছিল শস্য একতা (Crop Integrity), জীববৈচিত্র্য, ভেষজ ওষুধ এমনকি জন্ম নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে চমৎকার জ্ঞান। কিন্তু ইউরোপের সর্বত্র তখন ম্যাক্স ওয়েবার কথিত 'Social Darwinism' অর্থাৎ তীব্র মুনাফা বিস্তারের প্রতিযোগিতা 'ডাইনী'দের এবং তাদের সরল, পরিবেশবাদী ও মাতৃ-অধিকারভিত্তিক অর্থনীতিকে বাঁচতে দেয়নি। নতুন পিতৃতান্ত্রিক পুঁজিবাদ বরং সৃষ্টি করেছে domestic idyll নারীদের...। (অদিতি, ২০২০: ৪০-৪১)

সোঁদাল উপন্যাসের তিন্নি এক অরণ্যনারী। পিতৃতান্ত্রিক পুঁজিবাদের হাতে সৃষ্ট কোনো নারী নয় সে। তিন্নি তার একার অরণ্যজীবনে যেভাবে প্রকৃতির সাহচর্য-যাপন করেছে, অন্নের ব্যবস্থা করেছে, সেটি তার অরণ্য অভিজ্ঞানে ঋদ্ধ সত্তার বহিঃপ্রকাশ:

> এক বিঘা মতো হবে কোদালে কোপানো জমিটা, যাতে জল ধরে রেখে রোয়া বুনতে দেখলে সে একদিন তিন্নিকে। একদিন নদীর ধারে সে তিন্নির শোলাকচুর ভুঁইটাকে দেখল। শটীর চাষটা সে নিজে করে না। বুনো শুয়োরের অত্যাচার কমেছে বলে বনের সেই ফসল ভালোই হবে। তিনটে মোষ তিন্নির। একটা দুধ দেয় আর দুটোই বাচ্চা। বকনা মোষটার শিং ইতিমধ্যে এক হাত করে। ছোট এঁড়েটার শিং ইঞ্চি তিন-চার করে

> বেরিয়েছে। বর্ষার জলে ধুয়ে ধুয়ে মোষগুলোর শরীর ঝকঝকে, তিন্নির শরীর চকচকে। তার চুলগুলো যেন পাট পাট, আর আরও ঘন কালো। (অমিয়ভূষণ, ২০১০: ৯৫)

উপন্যাসে অরণ্য যেভাবে সারবান, অরণ্যচারী নারী তিন্নিও তেমন সুপুষ্ট। তার আশ্রয়েই নকশাল আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত গুলিবিদ্ধ মোন্নাথ বা মোদনাথ রাভা নতুন করে জীবন ফিরে পায়। মোন্নাথের দ্বিতীয় জন্ম হয় প্রকৃতিকন্যা তিন্নির হাতে। অরণ্য গুলিবিদ্ধ মোন্নাথকে আশ্রয় দিয়েছে, আর তিন্নি দিয়েছে নতুন জীবনের স্বাদ। নকশাল আন্দোলনর স্বপ্নদ্রষ্টা মোন্নাথ তখন গুলিবিদ্ধ। এ অবস্থায় মৃত্যুকে আলিঙ্গন করতে করতেই জ্বরগ্রস্ত অবস্থায় সে তিন্নির সন্তানকে জল থেকে উদ্ধার করে। গুলিবিদ্ধ, মৃতপ্রায় মোন্নাথের অচেতন, হাঁ খোলা ঠোঁটের ফাঁকে ঈষদুষ্ণ মোষের দুধ ঢেলে প্রাণ ফিরিয়ে এনেছিল তিন্নি। এভাবেই অরণ্য ও নারী মোন্নাথের ত্রাতা হয়ে ওঠে উপন্যাসে। মোদনাথ রাভার উপলব্ধি:

> অরণ্য:
>
> একটা পা আর এই লাঠিটা— তারই সাহায্যে চারদিনে এই বনে চলেছে সে। তার ডান উরুটা।... ভেঙেছে? গুলিতে ঝাঁজরা হয়েছে? আগুনে পুড়েছে? অবসানটা ওখান থেকে উঠে আসছে, যদি— হে বন, হে গোপনীয়তা, হে শাল, তাড়াতাড়ি করো। বনে ঢুকতে পেরে সে যন্ত্রণা সত্ত্বেও প্রথম সন্ধ্যাতে হেসে উঠেছিল। (অমিয়ভূষণ, ২০১০: ৯১)
>
> তিন্নি:
>
> সে দৃষ্টি স্থির করে সেই লম্বা কালো মেয়েটিকে দেখল। মোন্নাতের স্মৃতিতে আছে, বড় বড় চোখের সেই কালো মেয়ে, যার পরনে খুব খাটো হলুদ শাড়ি, তার বুকের যে আধখানা দু-এক মিনিট থেকে মোন্নাতের চোখে পড়ছিল, সেটাকেই যেন মোন্নাতের ঠোঁটের ওপর ধরেছিল, আর উষ্ণ সুস্বাদের তরল জীবন তার মুখ, গলা, বুক সারা শরীরে ধীরে ধীরে ছড়াচ্ছিল। এটা অবশ্য ঠিক নয় যে সেই কালো তিন্নির শরীর থেকে তার শরীরে জীবনের ধারা আসছিল। পাশে রাখা বাঁশ-চোং থেকে আরও ছোট তেমন বাঁশ চোং-এ ঢেলে ঈষদুষ্ণ মোষের দুধ ঢালছিল তিন্নি তখন,...। (অমিয়ভূষণ, ২০১০: ৯৪)

এভাবেই অরণ্য আর নারী সমার্থক হয়ে ওঠে *সোঁদাল* উপন্যাসে। আর সেই সমার্থকতায় পুঁজিবাদী পুরুষতন্ত্রের নিপীড়নের তত্ত্ব দ্বৈততাবোধ কিংবা ডুয়ালিজম ধারণার ব্যবচ্ছেদ ঘটায়। যদিও অরণ্য অভিজ্ঞানে ঋদ্ধ তিন্নি এবং তাকে ঘিরে থাকা অরণ্যকে পুঁজিবাদী পুরুষতন্ত্রের হাতে নিগৃহীত হতে হয় বার বার। উপন্যাসে লেখক অরণ্যবিনষ্টিকারী ভোগবাদী পুরুষতন্ত্রের হাতে নিগৃহীত প্রকৃতি ও নারীর বেদনাঘন ছবি আঁকেন:

> বন যখন বনের মানুষকে বেআব্রু করে চলে গেল, ছোট শালবাড়ি আর বড় শালবাড়ি নামের সেই দিগন্তব্যাপী শালবন কেটে বসানো গ্রামদুটোর মধ্যে কয়েকশো একরের ছোট বনটি কয়েকশো মাত্র ছোট শালগাছ অবশিষ্ট রেখে মিলিয়ে গেল, তখন জিন্নি একটা ভৈষী আর তার একটা এঁড়ে, একটা বকনা বাছুর নিয়ে ছোট শালবাড়ি গ্রামের সীমায় উঠে

> যাওয়া বাথানটায় সূর্যের আলোর জালে ধরা পড়ে গিয়েছিল। বেআব্রু হওয়া কালো এক মেয়ে, তার এক ভৈষী, তার এক এঁড়ে বাছুর, এক বকনা। (অমিয়ভূষণ, ২০১০: ৮৪)

উপর্যুক্ত উক্তিতে 'বেআব্রু' শব্দের মধ্য দিয়ে উন্মোচিত হয় তিন্নির বেদনার আখ্যান। তিন্নির কাছে মোন্নাত তার সন্তানের পিতার পরিচয় জানতে চায়; তিন্নির উত্তরে পুরুষতন্ত্রের ভোগবাদী কাপুরুষোচিত চেহারা উন্মোচিত হয় :

> মোন্নাত জিজ্ঞাসা করল, 'তো, তোমার বাচ্চার বাপ কোটে বা কাঁয়? এত দিনেও না আইসে।' তিন্নি গালে হাত দিয়ে দরজার বাইরে জলের ঝাপটায় গাছগুলোর পাতা নড়া দেখতে লাগল।... বলল, 'কাঁয় জানে?... সে চোখ নিচু করে বলল, 'বনর সাহেব হবার পায়, বনর রক্ষী হবার পায়। হইবে একজন।' (অমিয়ভূষণ, ২০১০: ৯৬)

প্রকৃতি তিন্নির মতো অরণ্যচারী নারীর জন্য আশ্রয় হলেও অরণ্যখেকো মানুষ অরণ্যে প্রবেশ করলে বনবাসী নারীর ওপর নেমে আসে বর্বরোচিত অত্যাচার। মোন্নাথ তিন্নিকে ফেলে চলে যাবার পর তাই তিন্নিকে সইতে হয় চরম নির্যাতন। সাফারিস্যুট পরা বনরক্ষীরা তিন্নির ওপর চড়াও হয়। উপন্যাসের মূল চরিত্র মোন্নাত যখন শুনতে পায়, দক্ষিণের অরণ্য কেটে ফেলা হয়েছে, অরণ্য-বিনাশে শিকারিও তার তীর ধনুক বাঁধা দিয়ে মদ খাচ্ছে, তখন তার মনে হয় অরণ্যহীনতায় তিন্নি হয়তো সংকটে পতিত হবে। মনে হয়, 'বন নাই থাকে মানুষ কোটে বা থাকে?' (অমিয়ভূষণ, ২০১০: ৯৯) এই ভাবনা থেকে মোন্নাত তিন্নির কাছে ফিরে যেতে চায়। অরণ্যপথ অতিক্রম করে সে যখন তিন্নির অরণ্যগৃহের কাছে ফিরে যায়, দূর থেকে সে এক নারীর আর্তনাদ শুনতে পায়। কাছে গিয়ে অপমানাহত-ধর্ষিত তিন্নির কুঁকড়ে যাওয়া যন্ত্রণাকাতর শরীর দেখে সে ভাবে:

> তিন্নি, তিন্নিই তো! দুজন মানুষ। একজন পিছন থেকে তার কাটারি সমেত দু-হাত চেপে ধরেছে, অন্যজন সামনে থেকে তার কোমরের শাড়ি খুলে ফেলেছে। এক মুহূর্ত, দুই মুহূর্ত।... সামনের লোকটি সেই উলঙ্গ শরীরের ঊরুর উপরে, আর পিছনের লোকটি সেই শরীরের বুকের উপরে। (অমিয়ভূষণ, ২০১০: ১০০)

মোন্নাত দূর থেকে তিন্নিকে বাঁচাতে তীর ছুঁড়লে তিন্নি মোচড় খেয়ে উঠে দাঁড়িয়ে নিজেকে সামলে কোমর থেকে খসে পড়া কাটারি দিয়ে একজন ধর্ষককে আহত করে। অরণ্যখেকো বনরক্ষীদের হাতে নিগৃহীত তিন্নিকে ছাড়তে হয় অরণ্যজীবন। তুরুককাটা শহর হয় নতুন আবাস। অরণ্যবিচ্ছিন্ন নারী অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার লড়াইয়ে পরাজিত হয়। কারণ, শহুরে জীবন তাকে আরও গভীরভাবে নিরাশ্রয় আর অপমানের মুখোমুখি করে। ঔপন্যাসিকের ভাষায়:

> তিন্নির তুরুককাটা শহরে পৌঁছতে এক বছর লেগে গেল। পথে সে আরও দু-একটা শহর দেখে এসেছে। মাস ছয়েক আগে তার একবার গর্ভপাত হয়েছে। কারণ সেই ভৈষী-দুটোর মতোই যদি শুকনো দিনে গাছতলাতেই থাকো, অথবা বর্ষা-বাদলের দিনে মূল্য কমে যাওয়া রেল স্টেশনের পরিত্যক্ত পার্সেল গুদামের ছাগলের নাদ ছড়ানো বারান্দাতেই

> থাকো, অথবা ভিখারী হও, উন্মাদ হও, রোয়াগাড়া কামলা হও, বাড়ির দাসী হও, অসুস্থ হও, এক বোধহয় কুষ্ঠি হওয়া ছাড়া রেহাই নেই। বোধহয় কুষ্ঠিরও রেহাই নেই।... এই শহরের নাম তুরুকাটা, যেমন নাকি শিলিগুড়ি নাম আছে এক শহরের, কৈলকাতা নাম আছে আর এক শহরের। তার বাড়িউলি, ভাটিয়া সেই মাসি ইতিমধ্যে একদিন বলেছে তাকে, শিলিগুড়িতে গেলে মেয়েদের আরও লাভ, কৈলকাতায় তার চাইতেও বেশি। আর তার তো এই চার হাত লোহার শরীর...। (অমিয়ভূষণ, ২০১০: ১১৮-১১৯)

এ উপন্যাসে কৈচন্দ্র বর্মন, অমল তরুরাজ কিংবা খোকনেন্দ্র দাসের মতো পুঁজিবাদী পুরুষতন্ত্র প্রকৃতি ও নারীকে বিনষ্ট করে তাদের অনৈতিকভাবে ভোগ করে। এদের হাতেই 'দলদলি' গ্রাম তার পুরনো খোল নলচে পাল্টে হয়ে যায় 'নয়াবস্তি'। ভোটের রাজনীতিতে আদর্শগত পার্থক্য থাকলেও অরণ্যনিধন করে চোরাইকাঠের ব্যবসায় এদের হিস্যা সমান। অরণ্য আর নারী সমানভাবে এদের হাতে ধর্ষিত ও কর্ষিত হয়। ব্যথিতচিত্তে তিন্নি অনুভব করে, তার কোমরে গোঁজা কাট্যারিটাও শহরে এসে সে হারিয়ে ফেলেছে। তুরুককাটার তিন্নি আর অরণ্যচারী তিন্নি পুরোপুরি বিপরীত; অরক্ষিত-অরণ্যহীন হয়ে এই নারী শেষ পর্যন্ত নগর বারাঙ্গনায় পরিণত হয়; অরণ্যখেকো সভ্যতা আর শহর হয়ে ওঠার তীব্র আকাঙ্ক্ষায় ব্যগ্র শহর তুরুককাটা তাকে তার সন্তান তথা অস্তিত্ব, কাটারি তথা নিরাপত্তা এবং ভৈষী তথা অর্থনৈতিক স্বাবলম্বন থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়। বিচ্ছিন্নতা তার ভেতর যে গাঢ় অস্তিত্বসংকটের জন্ম দেয়, সেই সংকট থেকে উত্তরণের চেষ্টায় ব্যগ্র হয়ে ওঠে এ নারী। লেখকের ভাষায়, মোন্নাত তাই '...এক হাটে বেশ হালকা কিন্তু মজবুত, ধারালো, মোটরগাড়ি স্প্রি-এর ইস্পাতে তৈরি, বড় একটা কাটারি দেখে তা কিনে দিয়েছে তিন্নিকে। কারণ বনের বটি ছাওয়ার কোমরৎ কাটারী নাই তাকে তো নাঙ্গা মনে হয়।' (অমিয়ভূষণ, ২০১০: ১২৭) মূলত, নারী ও প্রকৃতির ভেতরকার গভীর যোগের বিষয়টিকেই পরিবেশ নারীবাদের তাত্ত্বিকগণ খুঁজে বের করতে চান। প্রকৃতি বা পরিবেশের ক্ষতিসাধন হলে তার প্রভাব নারীর ওপরেও যে এসে পড়ে, পরিবেশ নারীবাদীরা সেই বিষয়টিতেই জোর দেন:

> The current system of global inequity, interpersonal and international violence, and international violence and environmental degradation may seem beyond the scope of feminist analysis at first glance... Certainly toxic waste, air pollution, contaminated groundwater, increased militarization, and the like are not exclusively women's issues;... But ecofeminists claim that environmental issues are feminist issues because it is women and children who are the first to suffer the consequences of injustice and environmental destruction. (Greta/Lori, 1993: 1-35)

অমিয়ভূষণ তাঁর *সোঁদাল* উপন্যাসে অরণ্য ও নারীর পারস্পরিক ক্ষতিকেই চিহ্নিত করেছেন। তবে, এই ক্ষতির পাশাপাশি লেখক প্রকৃতির প্রবল শক্তিকেও প্রকাশ করেন। প্রকাশ করেন অরণ্যের মতোই নারীর প্রবল ব্যক্তিত্বকে। প্রকৃতিকে একদা পবিত্র এক ক্ষমতাময়ী এবং গভীর উর্বরতাশক্তির প্রতীক হিসেবে চিহ্নিত করা হতো।

উর্বর প্রকৃতির মতো নারীকেও প্রবলভাবে জননশক্তিসম্পন্ন মনে করা হতো। কিন্তু, পুঁজিবাদী পুরুষতন্ত্রের সহিংসতায় এ দুই শক্তিই শেষপর্যন্ত বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। সমালোচক লিখেছেন:

> ক্যারোলিন মার্চেন্ট তাঁর *The Death of Nature: Women, Ecology and the Scientific Revolution* (১৯৮৩) গ্রন্থে দেখিয়েছেন, ফ্রান্সিস বেকন, যাকে আধুনিক বিজ্ঞানের জনক বলা হয়, তৎকালীন ইংল্যান্ডে নব্য বিকাশমান পুঁজির স্বার্থে, 'বিজ্ঞানের নামে দুষ্ট ও অবাধ্য রমণীর' ন্যায় প্রকৃতিকে জয় করার জন্য যাবতীয় সহিংস ও কঠোর পদক্ষেপ (যেমন বাঁধ নির্মাণ, মাইন বিস্ফোরণ) গ্রহণের জন্য আহবান জানান।... রেঁনেসা প্রকল্পের নতুন ও 'নিরপেক্ষ' বিজ্ঞান রসায়ন ও পদার্থবিদ্যার কঠোর সহিংসতায় ক্ষমতাময়ী মা প্রকৃতিকে দুর্বল, নিষ্ক্রিয়, বশ্য বস্তুতে পরিণত করা হল। প্রকৃতি অবশ্য এর প্রতিশোধ নিচ্ছে। (অদিতি, ২০২০: ৪০)

এ প্রতিশোধ মানবসৃষ্ট বিপর্যয়ের বিরুদ্ধে প্রকৃতির পূর্বরূপে ফিরে আসার প্রক্রিয়া। অমিয়ভূষণ তাঁর উপন্যাসে প্রকৃতির এই ধরনের প্রতিশোধের বেশ কিছু চিত্র এঁকেছেন। *সোঁদাল* উপন্যাসে বিপর্যস্ত প্রকৃতি ও নারীকে প্রতিশোধস্পৃহায় স্বরূপে ফিরে আসবার আকাঙ্ক্ষায় প্রকাশ করেন অমিয়ভূষণ। ধর্ষিত তিন্নি এবং উচ্ছেদকৃত প্রকৃতি উপন্যাসে সমান্তরাল হয়ে ওঠে:

> ... এই তিনমাসে আবার তার রঙ সবজে-শ্যামল বনের মতো, চোখের কোণে কালি নেই বলে সেই বড় বড় বাদামি কালো মণিদুটো কোনো এক পাখির চোখের মতো স্পষ্ট হয়ে চোখে পড়ে।... কাল বিকেলে সেই ছোট বনটায় তারা পৌঁছেছিল। এটা বনই নয়। নদীতে ভেঙে যাওয়া গ্রাম, যা নদী সরে যাওয়াতে বন হয়ে গিয়েছে। কাল তখন রোদ পড়ে যাওয়ায় দূরে নদীর দিকে তাকালে চোখ ধাঁধিয়ে যাচ্ছিল না। দক্ষিণের উঁচু বাঁধ, যার উপরে এখন পাকা চওড়া সড়ক, তার এ পারের ঢালু শ্যাওলা-সবুজ গা থেকে শুরু করে, এই বনটার উত্তর সীমার, ফাল্গুনে গেরুয়া রঙধরা বড় বড় ঘাসের রেখার মধ্যে, গত ছ-সাত বছরে তৈরি হয়ে ওঠা এই বন। মরুচমতী নদী এখন এপার থেকে একেবারে ওপারে চলে গেছে, যেন মানুষের বাঁধ দেয়ার ঘৃণাতে। গেরুয়া রঙধরা সেই ঘাসের সীমার পরে, সে জন্য, সাদা চিকচিকে বালি অনেক দূর।... এদিকে গেরুয়ার রঙ ধরেছে এমন ঘাসের রেখা, তার এপারে একশো রকমের সবুজ বাঁধের গোড়া পর্যন্ত গিয়ে, শ্যাওলা সবুজ হযে বাঁধের গা বেয়ে উঠেছে। কালচে সবুজ, কলাপাতা সবুজ, টিয়া সবুজ, পান্না সবুজ। ডান হাতের দিকে কয়েকটা শিশু শাল, গোটা দু-এক তেমন শিমুল, একটা ছোট কদম, কিন্তু পর পর এক সারি সোঁদাল, সব ছাড়িয়ে একটা কলার থোপ (অমিয়ভূষণ, ২০১০: ১২৮)।

এখানে, বনরক্ষী কর্তৃক বার বার ধর্ষিত তিন্নি এবং পুঁজিবাদী পুরুষতন্ত্র কর্তৃক উচ্ছেদকৃত অরণ্য যেন নিজের মূল অস্তিত্বের কাছে ফিরে আসতে চাইছে। এভাবেই পুঁজিবাদী পুরুষতন্ত্রের বিরুদ্ধে নারী ও প্রকৃতি প্রতিশোধ নিতে চায়। ১৯৭৯ সালের আগস্ট মাসে পেনসিলভেনিয়ার নিউক্লিয়ার দুর্ঘটনার পর নারীবাদ, শান্তি এবং শক্তি

নিয়ে কাজ করেন এমন বারো জন নারী পরিবেশ নারীবাদ-নারীর সঙ্গে পরিবেশের সম্পর্ক এবং নারীবাদ ও পুরুষতন্ত্রের আগ্রাসী আচরণ নিয়ে একটি আলোচনার আয়োজন করেন এবং তারা 'Women and life on Earth' শীর্ষক সম্মেলনে সম্মিলিতভাবে কাজ করবার ব্যাপারে অঙ্গীকারাবদ্ধ হন। ১৯৮০ সালের দিকে তাঁরা 'Women and Life on Earth: a conference on eco-feminism in the 80's' শীর্ষক একটি কনফারেন্সের আয়োজন করেন। এ কনফারেন্সে জনেস্ত্রা কিং 'The Ecology of Feminism and the Feminism of Ecology' নামক একটি ভাষণ রচনা করেন এবং সেই সঙ্গে তিনি পেন্টাগনে নারী, বর্ণবাদ এবং পৃথিবীর প্রতি ধ্বংসাত্মক আচরণের প্রতিবাদে আয়োজন করেন একটি শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদের। প্রায় শ'দুয়েক নারী একে অপরের হাতে হাত রেখে সমাজে তাদের সামাজিক-অর্থনৈতিক এবং প্রজননসম্পর্কিত অধিকার দাবি করবার পাশাপাশি বর্ণবাদ ও শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানান। পরিবেশ-নারীবাদের ইতিহাসে এ আন্দোলন 'উইমেন্স পেন্টাগন অ্যাকশন আন্দোলন' নামে পরিচিত। পরিবেশ নারীবাদের ইতিহাসের সঙ্গে এভাবেই তিন্নির প্রতি পুঁজিবাদী পুরুষতন্ত্রের আগ্রাসী আচরণের প্রতিবাদ প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে। ইকোক্রিটিক যাঁরা, তাঁরা এ ভাবনার পক্ষে যুক্তি দিতে গিয়ে কালিদাসের শকুন্তলাকে উদাহরণ হিসেবে দেখিয়েছেন:

> কালিদাস বলতে চেয়েছেন মানুষ প্রকৃতির কাছাকাছি যতক্ষণ থাকে, ততক্ষণ সে সুখে থাকে, প্রকৃতিবিযুক্ত হলে তার মানসিক সংকট সৃষ্টি হয়।... রাজা দুষ্মন্ত অরণ্যের কেউ নন। প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর স্বেচ্ছাচারিতার আনন্দে এক হরিণের দিকে তীর নিক্ষেপ করতে গেলে তপস্বী তাঁকে বলেন: মহারাজ, আশ্রমমৃগ বধ করবেন না— ... দুষ্মন্তের আচরণ এবং পরবর্তীকালে শকুন্তলাকে প্রত্যাখ্যানের মধ্য দিয়ে একদিকে যেমন প্রতিফলিত হয় প্রকৃতির ওপর তাঁর খবরদারির উল্লাস এবং এই উল্লাসের সঙ্গে সাযুজ্য রেখে তাঁর পিতৃতান্ত্রিক মানসিকতা। কন্ব শকুন্তলাকে পতিগৃহে পাঠানোর সময়... দুষ্মন্তের রাজসভায় আসায় শকুন্তলা বিচ্ছিন্নতা বোধ করছেন,... প্রকৃতিবিচ্ছিন্ন শকুন্তলার এই যন্ত্রণা আজকের জলবায়ু সংকটের কবলে পড়া সকল মানুষের বিপন্নতার সঙ্গে যেন এক হয়ে যায়। শকুন্তলা ফিরে আসেন প্রকৃতির মধ্যে। শান্ত হয় তাঁর মন। এই আশ্রমেই দুষ্মন্তের সঙ্গে তাঁর পুনর্মিলন হয়। এই মিলন নিছক নরনারীর মিলন নয়, বস্তুত তাঁদের আকাঙ্ক্ষার সমলয়ন, নারী পুরুষের মধ্যের প্রাকৃতিক সম্পর্কের পুনরুদ্ধার, প্রকৃতির কোলে তাঁদের পুনরুজ্জীবনকেই বোঝায়। (শঙ্খদীপ, ২০২০)

তপোবনে দুষ্মন্ত ও শকুন্তলার মিলনের যে আন্তরিক দৃশ্যপট রচিত হয়েছে নাটকে, সেরকম দৃশ্যপট *সোঁদালে* তিন্নি এবং মোন্নাথের মিলনের মধ্যেও পরিলক্ষিত হয়। উপন্যাস শেষে তিন্নি ও মোন্নাত কলুষিত বস্তিজীবনসদৃশ নগর ছেড়ে অরণ্যের পথে পা বাড়ায়। *মহিষকুড়ার উপকথা* উপন্যাসে 'আসফাকে'র পিরহানের মতোই পরনের গোলাপি শাড়ি ছেড়ে হলুদ সোঁদাল রঙের শাড়ি পরে তিন্নি শহুরে বেশ্যা জীবনের ইতি

টেনে যেন ফিরিয়ে আনতে চায় তার স্বস্তির অরণ্যজীবন। একসময় কাটারিও ফিরে আসে কোমরে। তার শরীরে সবজেটে শ্যামল লাবণ্য ফেরে ঘনবর্ষার অরণ্যের মতো। তিন মাস ধরে অরণ্যজীবনে ফিরে চলার পথে তিন্নি ও মোদনাথ রাভা যাযাবর জীবনে সংসার পাতে। তিন্নির আবেগকম্পিত কণ্ঠ বলেছিল, 'একটা রাতি থাকিবার দে। জীবনের সোয়াদ মিটায়ে নিম্' (অমিয়ভূষণ, ২০১০: ১২৭)। যদিও শেষপর্যন্ত জীবনের স্বাদ আর মেটে না। মোন্নাতের মৃত্যু সে স্বাদ ফিকে করে দেয়। ঔপন্যাসিক বোঝাতে চেয়েছেন, অরণ্যই একমাত্র আশ্রয় যেখানে মোন্নাত এবং তিন্নির মতো নিগৃহীত মানবাত্মা জীবনসংকট উত্তরণে অস্তিত্ববান হয়ে ওঠার পরিসর পায়। অরণ্যহীন বর্বর জীবন কেবল ব্যক্তিস্বার্থপ্রধান। প্রসঙ্গক্রমে বঙ্কিমচন্দ্রের *কপালকুণ্ডলা* উপন্যাসের কপালকুণ্ডলার কথা মনে পড়ে। কপালকুণ্ডলা তার মৃন্ময়ী নাম অস্বীকার করে, বিবাহ কিংবা দাম্পত্যজীবনকে শৃঙ্খল হিসেবে গণ্য করে গভীর অরণ্যের কাছেই ফিরে যেতে চায়। এক অনির্দিষ্ট পরিণতির মধ্য দিয়ে অরণ্যবিচ্ছিন্ন এ নারী অন্তর্হিত হয়। অরণ্যহীনতাই তার ভেতর অস্তিত্বসংকটের জন্ম দেয়। কপালকুণ্ডলার মতো মানুষ যে মূলত প্রকৃতির সন্তান, রবীন্দ্রসাহিত্যে সেই বিষয়টি গভীরভাবে প্রকাশিত। রবীন্দ্রসাহিত্যে প্রকৃতি ও মানুষ একে অপরের মধ্যে লীন হয়ে আছে। সমালোচক মনে করেন, "... তিনি ঋগ্বেদের ঋষির মতো নিসর্গ দেখে বিস্মিত ও আন্দোলিত হয়ে উচ্চারণ করেন— 'হই যদি মাটি, হই যদি জল/হই যদি তৃণ, হই ফুলফল/জীবসাথে যদি ফিরি ধরাতল,/কিছুতেই নাই ভাবনা,/যেথা যাব সেথা অসমী বাঁধনে/অন্তবিহীন আপনা।' আত্মকে বিশ্বপ্রাণের সঙ্গে যুক্ত করলে তা হয় অনন্ত। একে বলা হয় সর্বপ্রাণবাদ-চিন্তন ও অতীত-বিস্মৃত অস্তিত্বধারার পুনরুজ্জীবন। কবির জন্মপূর্ব অস্তিত্ব পৃথিবীর সঙ্গে এক হয়ে ছিল, তখন আলোতে বৃষ্টিতে তিনি পরিস্নাত হতেন।" (বেগম আকতার, ২০১৪: ৭)। এভাবে প্রতিনিয়ত রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতির সঙ্গে যুক্ত হয়ে তাঁর সাহিত্যকে করেছেন মানবপ্রেমযুক্ত। তাঁর 'সমুদ্রের প্রতি', 'অহল্যার প্রতি', 'বসুন্ধরা' ইত্যাদি কবিতার মতো আরও অসংখ্য কবিতায় পরিবেশ নারীবাদের প্রকাশ লক্ষণীয়। কবির সত্তায় নারী ও পুরুষ দুই সত্তাই বিদ্যমান। তিনি প্রকৃতির সঙ্গে লীন হয়ে গেছেন তাঁর উভয় সত্তাতেই। তবে, কবির চেতনসত্তায় প্রাণময়ী নারীর উপস্থিতি প্রবল। তাঁর জীবনদেবতাও কখনও কখনও 'কৌতুকময়ী' নারী। এ নারী প্রকৃতির সঙ্গে সর্বদা নিবিড়ভাবে যুক্ত। *ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণের* প্রকৃতি খণ্ডে দেবীদের প্রকৃতি নামে আখ্যা দেওয়া হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, যে দেবী সৃষ্টিবিষয়ে প্রকৃষ্টা, তিনিই প্রকৃতি। যিনি সৃষ্টি করতে সমর্থ, তাকেই প্রকৃতি বলে। এখানে প্র শব্দের অর্থ সত্ত্ব, কৃ শব্দের অর্থ রজঃ এবং তি শব্দের অর্থ তমঃ। যিনি এই ত্রিগুণ নিজের ভেতর ধারণ করেন এবং যিনি সর্বশক্তিসমন্বিতা ও সৃষ্টিকরণে প্রধান, তিনিই প্রকৃতি। এখানে নারী ও প্রকৃতি এই তিনগুণের আধার হিসেবে একীভূত।

রবীন্দ্রনাথ নারী ও প্রকৃতির এ একীভূত সত্তার অনুরণন উপলব্ধি করেছেন। আর তাই যন্ত্রসভ্যতার আগ্রাসনে ক্লান্ত কবি অরণ্যের কাছই শুশ্রূষা প্রার্থনা করে লেখেন, 'দাও ফিরে সে অরণ্য, লও এ নগর,/লও যত লৌহ লোষ্ট্র কাষ্ঠ ও প্রস্তর/হে নবসভ্যতা! হে নিষ্ঠুর সর্বগ্রাসী,/দাও সেই তপোবন পুণ্যচ্ছায়ারাশি,/গ্লানিহীন দিনগুলি।' ('চৈতালী') শুধু রবীন্দ্রনাথই নন, এ শুশ্রূষার আকাঙ্ক্ষা ধ্বনিত হয়েছে অমিয়ভূষণের সাহিত্যেও। *সোঁদাল* উপন্যাসের তিন্নি কিংবা পঙ্কিনী রাভার ভেতরে অরণ্যবিচ্ছিন্ন অস্তিত্বসংকট প্রকট হয়ে উঠেছে। অরণ্যের বিধ্বস্ত সত্তার পাশাপাশি এ উপন্যাসের নারীদের যে নিগৃহীত সত্তার বেদনার কথা অমিয়ভূষণ মজুমদার তুলে ধরেছেন, পরিবেশ নারীবাদী তত্ত্বের আলোকে সেটি আরও বেশি প্রাসঙ্গিকতা পেয়েছে। প্রকৃতি ও নারীর পারস্পরিক সম্পর্ক, সভ্যতারক্ষায় তাদের ভূমিকা এবং তাদের সুস্থ-স্বাধীন অস্তিত্ব রক্ষায় পরিবেশ নারীবাদী তাত্ত্বিকেরা প্রবলভাবে সচেতন। অমিয়ভূষণ মজুমদার পরোক্ষভাবে নারী ও অরণ্যরক্ষায় তাঁর লেখনীর মাধ্যমে পরিবেশ নারীবাদী তাত্ত্বিকদের এই বিষয়গুলোর সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত হয়ে গেছেন। *সোঁদাল* উপন্যাসই এর সবচেয়ে বড় প্রকাশ।

গ্রন্থ ও প্রবন্ধপঞ্জি

অদিতি ফাল্গুনী, ২০২০। *খসড়া খাতা: নারীবাদী সাহিত্যতত্ত্ব ও বিবিধ প্রসঙ্গ*, পরান কথা, ঢাকা।

অমিয়ভূষণ মজুমদার, ২০০২। 'নিজের কথা', *অমিয়ভূষণ রচনাসমগ্র ১*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।

অমিয়ভূষণ মজুমদার, ২০১০। 'সোঁদাল', *অমিয়ভূষণ রচনাসমগ্র ৮*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।

বিপ্লব মাজী, ২০০৯। *ইকোফেমিনিজম, নারীবাদ ও তৃতীয় দুনিয়ার প্রান্তিক নারী*, অঞ্জলী পাবলিশার্স, কলকাতা।

বেগম আকতার কামাল, ২০১৪। *রবীন্দ্রনাথ : যেথায় যত আলো*, অবসর, ঢাকা।

মন্দ্র আর্কাইভ, ২০২০। 'ইকোফেমিনিজম বা পরিবেশ নারীবাদ', available: https://mondro.org/2020/12/23/ইকোফেমিনিজম-বা-পরিবেশ-না/, গৃহীত: ফেব্রুয়ারি ১৫, ২০২২

মাসুদ রহমান, ২০২২। *নিসর্গ নারীবাদ*, ভাষাপ্রকাশ, ঢাকা।

রাশিদা আখতার খানম, ২০১৮। *নারীবাদ ও দার্শনিক প্রেক্ষাপট*, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা।

শঙ্খদীপ ভট্টাচার্য, ২০২০। 'ইকোফেমিনিসম — নারী, প্রকৃতি ও সমকাল', *পরিপ্রশ্ন*, available: https://pariprashna.website/article/art-and-literature/ ecofeminism-women-nature-and-the-contemporary/, গৃহীত: ফেব্রুয়ারি ২৩, ২০২২

সরদার ফজলুল করিম, ২০০৬। *দর্শনকোষ*, প্যাপিরাস, ঢাকা।

সুবোধ দেবসেন, ২০১০। *বাংলা উপন্যাসে আদিবাসী সমাজ*, পুস্তক বিপণি, কলকাতা।

Afroza Siddika, 2017. "Ecofeminism in Selected Novels of Anita Nair", *Journal of Gono Bishwabidyalay*, Savar, Dhaka, vol. 2, no. 1, pp. 9-22.

Alicia H. Puleo, 2017. 'What is ecofeminism', available: https://docplayer.net/219310411-What-is-ecofeminism-alicia-h-puleo-philosopher.html, accessed: January 23, 2022.

Bina Agarwal, 2005. 'The Gender and Environment Debate: Lessons from India', in N. Visvanathan, L. Duggan, L. Nisonoff and N. Wiegersma (eds.) *The Women, Gender & Development Reader*, Zed Books Ltd. London and New Jersy.

Greta Gaard and Lori Gruen, 1993. 'Ecofeminism: Toward Global Justice and Plaanetary Health', *Society and Nature*, Illinoias, USA, vol. 2, pp. 1-35.

Vandana Shiva, 1988. *Staying Alive: Women, Ecology and Survival in India*, Kali for Women, New Delhi.